যুদ্ধের কারণ তেল

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

থায় বলে 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'। ইরাকে সম্ভাব্য মার্কিন হামলা ইরাকি জনগণের দুর্দশা ডেকে আনলেও মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোকে এনে দিতে পারে হরিলুটের সুযোগ। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, বুশ প্রশাসনে যুদ্ধ-উন্মাদনার মূল কারণ ইরাকের বিপুল পরিমাণ তেলসম্পদ কব্জা করা। কেননা, আন্তর্জাতিক

সম্প্রদায়ের দাবি মেনে জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের সে দেশে প্রবেশের নিঃশর্ত অনুমতি দেয়ায়, ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা এখন অর্থহীন। এছাড়া ইরাক গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও পারমাণবিক বোমা তৈরি করছে বলে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করলেও এর সপক্ষে কোনো জোরালো প্রমাণ তারা উপস্থিত করতে পারেনি। উপরন্তু, জাতিসংঘের অস্ত্রপরিদর্শক দলের সাবেক প্রধান স্কট রিটার বারবার বলছেন, ইরাকে এ ধরনের কোনো অস্ত্র নেই। সাত বছর পরিদর্শনের পর অস্ত্র পরিদর্শকরা জাতিসংঘে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তাতে ইরাককে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছিল। এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কমিশনও ইরাকে পারমাণবিক অস্ত্রের কোনো সন্ধান পায়নি। এমনকি, ইরাককে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা এবং আল-কায়েদার সঙ্গে জড়ানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার কর্তাব্যক্তিদের এহেন

'যুদ্ধ যুদ্ধ রব' তোলার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে? বিশ্লেষকদের ধারণা, এর পেছনে বড় কারণ ইরাকের বিপুল তেল ভান্ডার। অবশ্য সাম্প্রতিক জরিপে ২৬ শতাংশ মার্কিনি বলেছেন, আসন্ন কংগ্রেস নির্বাচনে ভোটারদের দৃষ্টি যুক্তরাষ্ট্রের ভঙ্গুর অর্থনীতি থেকে সরিয়ে রাখাও বুশের যুদ্ধযজ্ঞের অন্যতম কারণ। এছাড়া বুশ ঘোষিত 'অশুভ চক্রের' অন্যতম দুই শরিক ইরাক ও ইরান। ইরাকে মার্কিন প্রভাব

পাকাপোক্ত করতে পারলে ইরানকে দমিয়ে রাখা সহজ হবে। তবে সামগ্রিক বিচারে, যুদ্ধযজ্ঞের অন্যতম উদ্দেশ্য ইরাকের তেল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্ব জনমত উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্ট বুশ যুদ্ধের সপক্ষে কংগ্রেস সমর্থনের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। সম্ভবত কংগ্রেস তাকে যুদ্ধের ক্ষমতা দিয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবে। কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেমোক্রেট নেতা টম ড্যাশেল সেই আভাসই দিয়েছেন। ইরাকে হামলা তাই সময়ের ব্যাপার। ইরাকি তেলের ওপর মার্কিন তেল কোম্পানির লোলুপ দৃষ্টিই মূলত বুশ প্রশাসনকে ঠেলে দিচ্ছে একটি অযাচিত যুদ্ধের দিকে।

রুদ্ধশ্বাস

জার্মান নির্বাচন

জার্মানি থেকে **সরাফউদ্দিন আহমেদ**

এক শ্বাসরুদ্ধকর বিজয় অর্জন করলো জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডারের লাল-সবুজ কোয়ালিশন। জার্মান পার্লামেন্টের পনেরতম নির্বাচন অভূতপূর্ব নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে শেষ হলো। সর্বশেষ ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, শ্রোয়েডারের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট (এসপিডি) এবং গ্রিন পার্টির কোয়ালিশন জিতেছে ৪৭.১ ভাগ ভোট যা তাদের বুন্দেশটাগে ৩০৬টি আসন এনে দেবে। অন্যদিকে রক্ষণশীল জোটের এডমুন্ড স্টইবারের সিডিইউ/সিএসইউ এবং তার মিত্র লিবারেল ফ্রি ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছে ৪৫.৯ ভাগ ভোট। অর্থাৎ ২৯৫টি আসন। পূর্ণ ফলাফল ঘোষণার ঘন্টাখানেক আগেও স্টইবার রক্ষণশীল কোয়ালিশনের বিজয় ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। পরাজয়ের পর স্টইবার বলছেন, শ্রোয়েডারের নতুন মেয়াদ টিকবে বড়জোর বছরখানেক। চার বছর আগে ১৯৯৮ সালে জার্মানির রাজনীতিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপ্রতিরোধ্য চ্যান্সেলর হেলমুট কোহ্‌লকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল বামঘেঁষা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও পরিবেশবাদী গ্রিন পার্টির কোয়ালিশন।

ক্ষমতায় আসার আগে এই নেতৃত্ব ভোটারদের কথা দিয়েছিল বেকারত্বের হার কমাবার। একুশ শতাব্দীতে আরো উন্নততর প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে জার্মান অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়া ছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তা, বিদেশীদের জন্য নতুন নীতি ও নাগরিক আইন শিথিলসহ পরিবার, শিশু এবং বয়স্কদের ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হবার ইচ্ছা এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল।

ক্ষমতায় প্রথম দুই বছর ভালোই চলেছিল কোয়ালিশন সরকারের। বেকারত্ব কমে পঁয়ত্রিশ লাখে নেমে এসেছিল। সরকারের প্রবৃদ্ধি বাড়ছিল ক্রমান্বয়ে। ব্যয় সংকোচ ও লাগসই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের দেনা কমানো, পরিবার ও শিক্ষা খাতে সংস্কারসহ রক্ষণশীল খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাট ইউনিয়নের শত বাধার মুখে বিদেশীদের জন্য নীতিমালা ও নাগরিকত্ব আইনের সীমিত সংস্কারসহ পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে নতুন রাজস্ব আইন কোয়ালিশন সরকারকে জার্মান জনগণের কাছে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

কোয়ালিশন সরকারকে প্রথমেই ধাক্কা খেতে হয় ১৯৯৯ সালের কসোভোর যুদ্ধে ন্যাটো জোটের পক্ষে সরাসরি বলকানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে। কোয়ালিশন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং পরিবেশবাদী গ্রিন দলের সমর্থকদের মধ্যে একটি ব্যাপক অংশ সহিংস যুদ্ধ রাজনীতির বিরুদ্ধে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাও বিশ্ববাণিজ্য তথা পুঁজি বিনিয়োগে ভাটার সৃষ্টি হয়েছে। তার ছাপও পড়েছে জার্মান অর্থনীতিতে। সর্বশেষ আফগানিস্তান যুদ্ধেও সন্ত্রাসবিরোধী জোটের সঙ্গে জার্মানের যোগদানে মোটা দাগের খরচ বহন করতে হয়েছে জার্মান সরকারকে। শেষ দুই বছরে ক্ষমতাসীনদের জনপ্রিয়তা ছিল পড়তির দিকে। এরপর গত আগস্ট মাসে জার্মানিতে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা এবং ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধনীতির সঙ্গে ক্ষমতাসীন জার্মান সরকারের বড় রকমের মতদ্বৈতা বা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষে যোগ না দেয়া, চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার প্রতিদ্বন্দ্বী চ্যান্সেলর পদপ্রার্থী এডমুন্ড স্টইবারের সঙ্গে টেলিভিশন বিতর্ক সব মিলিয়ে হঠাৎ করেই ক্ষমতাসীনদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বন্যা উপদ্রুত এলাকায় চ্যান্সেলর শ্রোয়েডারের সশরীরে উপস্থিত থাকা এবং ইরাকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনঢ় অবস্থান তার গ্রহণযোগ্যতার পাল্লাকে ভারী করে।

এছাড়া চল্লিশ লাখ বেকারের প্রশ্নে ক্ষমতাসীনদের বক্তব্য বিশ্লেষণ নতুন করে হারজ কমিশন গঠন, এবং প্রাথমিক অবস্থায় বন্ধ হয়ে যাওয়া মধ্যম সারির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহজ শর্তে এক লাখ ইউরো ঋণ দেবার সিদ্ধান্ত অনেককেই আশাবাদী করে তুলেছে। অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রায়ান প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী স্টইবার বেকারত্ব ও বিদেশী খেদাও পলিসি নিয়ে অগ্রসর হলেও তার অতীতের বিভিন্ন অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ড ভোটারদের মধ্যে তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেনি। ফলাফল, আরও চারটি বছরের জন্য শ্রোয়েডারের গলায় বিজয়মাল্য অর্পণ।

শ্রীলঙ্কা

শান্তির প্রত্যাশা

দু'পক্ষের আলোচনাকারী : বালাসিংহ ও পাইরিস

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি থেকে সরে এসেছে তামিলরা। নরওয়ের মধ্যস্থতায় সম্প্রতি থাইল্যান্ডে দু'পক্ষের মধ্যে যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তাতে তামিলদের প্রতিনিধিত্বকারী দল এলটিটিই'র পক্ষের আলোচনাকারী আন্তন বালাসিংহম বলেছেন, তামিলরা এখন আর স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে আন্দোলন করছে না, পরিবর্তে তারা তামিল অধ্যুষিত জাফনা এলাকার স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে। তামিলরা প্রায় ২০ বছরের একটি দাবি থেকে সরে আসায় এখন শ্রীলঙ্কায় শান্তি আসবে বলে বলা হচ্ছে। শান্তির জন্য অবশ্য দু'পক্ষকে আরো অনেক ত্যাগ স্বীকার, নমনীয়তার পরিচয় দিতে হবে। তবে প্রধান যে দ্বন্দ্বটি ছিলো অর্থাৎ তামিলদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি এবং এর জবাবে সরকারের কঠোর অনমনীয়তা, তার একটি প্রাথমিক সমাধান হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে থাইল্যান্ডের শান্তি আলোচনাকে সফল বলছেন পর্যবেক্ষকরা।

শ্রীলঙ্কা সরকারের পক্ষে প্রধান আলোচক ছিলেন সংবিধান বিষয়ক মন্ত্রী জি.এল পেইরিস। আর তামিল টাইগারদের পক্ষে আন্তন বালাসিংহম। দু'পক্ষ মুখোমুখি এক টেবিলে। তাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী ভিদার হেলসেগেন। এরকম একটি সুন্দর পরিবেশের মধ্য দিয়ে গত ১৬, ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় এক নৌঘাঁটিতে শুরু হয় আলোচনা। আগেই বলা দরকার, দুইপক্ষের মুখোমুখি এক টেবিলে বসা দীর্ঘদিন ধরে নরওয়ের চেষ্টার ফসল। গত সাত বছর পর এটা ছিলো তামিলদের সঙ্গে সরকারের মুখোমুখি আলোচনা। প্রথম দিন অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষে দু'পক্ষের চারজন করে প্রতিনিধি নরওয়েজীয় কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে আলোচনার টেবিলে মুখোমুখি বসেন। তবে গৃহযুদ্ধ অবসানে সফল হওয়া যাবে, এটা প্রথম দিনে কেউ ভাবেনি। তবে আগ্রহী মনোভাব ছিলো দু'পক্ষের মধ্যে। উদ্বোধনী ভাষণে সরকারি দলের প্রতিনিধি বলেন, 'যে শত্রুতা আর ঘৃণা তাদের দেশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তা তারা পেছনে ফেলে এসেছেন। ১৮ বছর ধরে যে সমস্যার মোকাবেলা তারা করে চলেছেন এবার সত্যিই তার একটা সমাধানের সুযোগ আছে।' শ্রীলঙ্কা সরকার ব্যাপক মাত্রায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের অখন্ডতা ও ঐক্যের পক্ষেও

স্থায়ী শান্তি আনতে পারলে চন্দ্রিকা ইতিহাসের অংশ হবেন

বুশ প্রশাসনের কেউই অবশ্য ঘুণাক্ষরেও বলছেন না, যুদ্ধের কারণ তেল। কিন্তু হোয়াইট হাউজে ঘাঁটি গাড়া বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলোর ঠোঁটচাটা দেখে সহজেই বোঝা যায়, ইরাকে হামলার আসল উদ্দেশ্য। একটি প্রভাবশালী মার্কিন পত্রিকা সম্প্রতি এক রিপোর্টে বলেছে, 'মার্কিন নেতৃত্বে সাদ্দামকে উৎখাত ইরাক থেকে দীর্ঘসময় বহিষ্কৃত মার্কিন তেল কোম্পনিগুলোর জন্য মহোৎসবের মওকা করে দেবে।' যেমনটি দিয়েছে আফগানিস্তান এবং সমগ্র মধ্য এশিয়ায়। একটি যুদ্ধ ইরাকের বিশাল তেল মজুদ হস্তগত করতে সাহায্য করবে। যুক্তরাষ্ট্র এই সুযোগ ছাড়বে কেন?

ইরাকের বিপুল তেল মজুদের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। সৌদি আরবের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল মজুদ ইরাকের। দেশটির এ পর্যন্ত পরীক্ষিত মজুদ ১১২০ কোটি ব্যারেল। ইরাক-ইরান যুদ্ধের এক বছর আগে ১৯৭৯ সালে ইরাকের দৈনিক তেল উত্তোলনের পরিমাণ ছিলো ৩৫ লাখ ব্যারেল। '৯১-এর পর তেল উত্তোলনের পরিমাণ দৈনিক ২৫ লাখ ব্যারেল অতিক্রম না করলেও ইরাকের দৈনিক ৬০ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। মার্কিন তেল মাফিয়াদের তাই স্বাভাবিক টার্গেট ইরাক ।

উপরন্তু, পরিবর্তিত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে তেল একটি অন্যতম ফ্যাক্টর। যুক্তরাষ্ট্র সৌদি তেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে চাচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া থেকে তেল আমদানি শুরু করেছে, যা একযুগ আগেও ছিলো অকল্পনীয় ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে মস্কোর আলফা ব্যাংকের সিনিয়র তেল বিশ্লেষক কন্সট্যানটিন

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০

কুইজ প্রতিযোগিতা

বিস্তারিত জানতে ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

- আপনি কি একজন স্মার্ট মা?
- আপনার সন্তান কি জিনিয়াস?

জিতে নিন ফ্রিজ, কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট এবং আরো আকর্ষণীয় পুরস্কার

বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। জবাবে তামিল প্রতিনিধি বলেন, 'তারা আন্তরিকভাবে শান্তির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আলোচনা সাফল্যমন্ডিত করতে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে।' তামিল প্রতিনিধির এরকম আশাবাদী মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের ৬ ঘন্টার বৈঠক শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিলো তামিল অধ্যুষিত জাফনার পুনর্গঠন এবং জাফনা থেকে যে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে, তার একটা বিহিত করা। মূলত দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় অগ্রাধিকারগুলো চিহ্নিত করা ছিলো। শেষ দিন ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে একটা ঐতিহাসিক দিন। কারণ আগের দু'দিনের আলোচনার পরিবেশ এতোটা সহায়ক ছিলো যে অধিকাংশ বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য হয়। জাফনা উপদ্বীপের উন্নয়ন, পুনর্গঠন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে দু'পক্ষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করে। কিন্তু এসব বড় নয়, যে অগ্রগতির কারণে পশ্চাদপদ দক্ষিণ এশিয়ার এই খবরটি এএফপি, এপি, রয়টার্স, বিবিসি, সিএনএন-এর মতো প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যমে প্রধান শিরোনাম হয়েছিল। তার নেপথ্যে হচ্ছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি থেকে তামিলদের সরে আসা। এটি প্রথমত ছিলো অবিশ্বাস্য, দ্বিতীয়ত অকল্পনীয়। 'তামিলরা এখন আর দ্বীপরাষ্ট্রটির ভোগৌলিক বিভক্তি চায় না। পরিবর্তে তারা জাফনা উপদ্বীপের তামিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বনিয়ন্ত্রিত সরকার দাবি করে।' অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি থেকে তারা সরে আসে। তামিলদের এই নমনীয় অবস্থানে সন্তোষ প্রকাশ করেন সরকারের প্রতিনিধি জি.এল. পেইরিস। করতালি ও হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশে পেইরিস জানান, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনে তার সরকারের আপত্তি নেই। এতে তামিল প্রতিনিধিও খুশি হন। সন্তোষ প্রকাশ করেন নরওয়ের মধ্যস্থতাকারী ভিদার হেলগেসেন। কারণ মূল সমস্যা ছিলো তামিলদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবি। আর ২০ বছর পরে এসে এ রকম জোর দাবি ত্যাগ করায় শান্তির প্রত্যাশা জাগতে শুরু করে।

গেরিলারা সরে এসেছে স্বাধীনতার দাবি থেকে

শ্রীলঙ্কার এই অগ্রগতিকে শান্তির প্রত্যাশা না বলে উন্নয়নের প্রত্যাশাও বলা যায়। বাজেটের একটি বড় অংশ তাকে ব্যয় করতে হয় সামরিক খাতে। গত ২০ বছর ধরে প্রায় প্রতিদিন তামিলদের সঙ্গে সংঘর্ষে কোনো না কোনো দেশীয় সম্পদ ধ্বংসের পরেও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে গড়ে শ্রীলঙ্কার জিডিপি সবচেয়ে বেশি। সামরিক খাতে বাজেটের বড় অংশ ব্যয় করতে না হলে দেশটি অনেক দূর এগিয়ে যেতো। এবার অন্তত সে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখন দু'পক্ষকে শান্তিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। জাফনায় স্বায়ত্তশাসন, এলটিটিই বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণ, এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। দু'পক্ষ আগামী ৩১ অক্টোবর থেকে ৩ নবেম্বর, ২ থেকে ৫ ডিসেম্বর ও ৬ থেকে ৯ জানুয়ারি আরো তিনদফা বৈঠকে বসবে। তখন এসব বিষয় নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে। দু'পক্ষ যদি শান্তির মনোভাব নিয়ে কাজ করে, তবে সম্পূর্ণ অগ্রগতি অবশ্যই সম্ভব।

জামান আরশাদ

রেজনিকভ বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র তেল সরবরাহে যে কোনো ধরনের বিঘ্ন মোকাবেলায় প্রস্তুত হতে চায়। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বিশেষত সৌদি আরবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ১১ সেপ্টেম্বরের পর খারাপ হয়েছে। তাই তারা অন্য অঞ্চল থেকে আরও বেশি অপরিশোধিত তেল সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।' নতুন উৎস থেকে তেল প্রাপ্তি যুক্তরাষ্ট্রকে আরও বেশি ইসরাইলপন্থী হতে সাহায্য করবে। ইরাকি তেল শুধু মার্কিনিদের টার্গেট এ কথা বলা অবশ্য ভুল হবে। ৮০'র দশকের শেষের দিকে বাগদাদ-ওয়াশিংটন সম্পর্কে চিড় ধরলে মার্কিন কোম্পানিগুলোকে ইরাক থেকে বের করে দেয়া হয়। ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের পরপরই শুরু হয় উপসাগরীয় যুদ্ধ। দুটি যুদ্ধ ইরাকের তেল ক্ষেত্রগুলোর বিপুল ক্ষতি করে। বিশেষত উপসাগরীয় যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার অন্যতম টার্গেট ছিলো

বুশকে নাচাচ্ছে তেল মাফিয়ারা

ইরাকের তেল শোধনাগারসমূহ। '৯০ দশকে সাদ্দাম হোসেন যুদ্ধবিধ্বস্ত তেলক্ষেত্রসমূহের উন্নয়ন এবং নতুন মজুদ অনুসন্ধানের জন্য অ-মার্কিনি কোম্পানিগুলোর দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফলে অন্য কোম্পানিগলো বিশেষত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অপর চারটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলো ইরাকে ধর্না দিতে থাকে। '৯১-এর পর থেকে ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, ভারত, ইটালি, ভিয়েতনাম এবং আলজেরিয়াসহ এক ডজনেরও বেশি দেশ ইরাকি তেল ক্ষেত্রের উন্নয়ন, বিদ্যমান ব্যবস্থার সংস্কার এবং নতুন মজুদ অনুসন্ধানের জন্য নীতিগত চুক্তিতে উপনীত হয় বা সেই চেষ্টা চালায়। যদিও এসব চুক্তি জাতিসংঘের আরোপিত অর্থনৈতিক বিষেধাজ্ঞার কারণে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তবে ভবিষ্যতের নিরিখে অ-মার্কিনি তেল কোম্পানিগুলোর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতে থাকে। ১৯৯৭ সালে রাশিয়ার সর্ববৃহৎ তেল কোম্পানি লুকঅয়েল ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলের ১৫০ কোটি

উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইরাকের তেলক্ষেত্রসমূহ

ব্যারেল মজুদের পশ্চিম কুরনা তেলক্ষেত্রের উন্নয়ন করার জন্য ৪০ কোটি ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করে। গত অক্টোবরে রাশিয়ার অপর একটি তেল কোম্পানি স্লাভনেফত দক্ষিণ ইরাকের তুবা তেলক্ষেত্র থেকে তেল উত্তোলনের জন্য ৫ কোটি ২০ লাখ ডলারের চুক্তি করে। এছাড়া ৪০০ কোটি ডলারের প্রস্তাবিত রাশিয়া-ইরাক অর্থনৈতিক চুক্তিতে পশ্চিম ইরাকের মরুভূমিতে তেল অনুসন্ধানে রাশিয়ার কোম্পানিসমূহকে সুযোগ দেয়ার বিধান রাখা হয়। অন্যদিকে ফরাসি তেল কোম্পানি 'টোটাল ফিনা এলফ' ইরান সীমান্ত লাগোয়া ৩০০ কোটি ব্যারেল মজুদের মাজনুন তেলক্ষেত্র থেকে তেল উত্তোলনের অনুমতি পেয়েছে।

মার্কিন অয়েল জায়ান্টদের ডিঙিয়ে অন্য তেল কোম্পানিগুলোর ইরাকি তেলসম্পদে দখল নেয়ার প্রতিযোগিতা যুক্তরাষ্ট্র শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে এটা ভাবা বোকামি। ইরাকের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন কখনোই ইরাকি তেলের ওপর থেকে নজর সরায়নি। জাতিসংঘ আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে ইরাক নির্দিষ্ট পরিমাণ (দৈনিক সর্বোচ্চ ২৫ লাখ ব্যারেল) তেল উত্তোলন করতে পারে। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় এই তেল বাইরে রপ্তানি হয়। মজার ব্যাপার, এই ইরাকি তেলের সবচে' বড় ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এই ক্রয়ের পরিমাণ কমলেও এ বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র দৈনিক ১০ লাখ ব্যারেল ইরাকি তেল ক্রয় করেছে। এ বছর জুলাই মাসে জেনিনে ইসরাইলি গণহত্যার প্রতিবাদে ইরাক এক মাসের জন্য তেল রপ্তানি বন্ধ রাখে। এ সময় বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বেড়ে যায়। প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যুক্তরাষ্ট্র। বুশ প্রশাসন বুঝতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে তেলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন ইরাকি তেলের ওপর শতভাগ নিয়ন্ত্রণ। এজন্য প্রয়োজন একটি যুদ্ধ এবং সাদ্দামকে উৎখাত।

যুক্তরাষ্ট্রের রণপ্রস্তুতির প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে বেঁকে বসে নিরাপত্তা পরিষদের তিন সদস্য রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। কেননা ইরাকি তেলে তাদের প্রত্যেকের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। ইরাকের প্রতি সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে অনড় এই তিন দেশকে বশ করতে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করে ভিন্ন পথ। যার প্রমাণ মেলে সিআইএর সাবেক পরিচালক জেমস উলসের কথায়। সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাতের পক্ষে যারা ওকালতি করছেন উলসে তাদের অন্যতম। তিনি বলেন, 'ব্যাপারটি একদম সহজ। ফ্রান্স এবং রাশিয়ার তেল কোম্পানি আছে, যাদের স্বার্থ আছে ইরাকে। আমাদের উচিত তাদের এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, তারা যদি ইরাকে উপযুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের সহায়তা করে, তবে আমরাও এটি নিশ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যে নতুন ইরাকি সরকার এবং আমেরিকান কোম্পানি-গুলো তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। তবে তারা যদি সাদ্দামের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে, তাহলে নতুন ইরাকি সরকারের সহযোগিতা লাভ তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

সিআইএর সাবেক পরিচালকের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, নতুন ইরাকি সরকারের মনমানসিকতা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণ ওকাকিবহাল। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কেননা সাদ্দাম বিরোধী ইরাকি বিরোধী দলসমূহের জোট ইরাকি ন্যাশনাল কংগ্রেসকে (আইএনসি) পেছন থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করছে যুক্তরাষ্ট্র। সাদ্দাম উৎখাত হলে যারা যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে ইরাকে 'গণতান্ত্রিক' সরকার কায়েম করবে, সেই আইএনসি'র কাঁধে চেপেই মার্কিনিরা ইরাকের তেলসম্পদ করায়ত্তের পরিকল্পনা করেছে। ইরাকি বিরোধীদলীয় নেতারা সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে পরিষ্কার করে

জ্বলছে ইরাকের তেলক্ষেত্র

বলেছেন, তারা পূর্বের কোনো চুক্তি মানতে বাধ্য থাকবেন না। আইএনসি'র লন্ডন অফিসের কর্ণধার ফয়সাল কারাঘোলি (যিনি একজন পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার) জানিয়েছেন, 'আমরা নিশ্চিতরূপেই সব চুক্তি পর্যালোচনা করে দেখবো।' অন্যদিকে, আইএনসি প্রধান আহমেদ চালাবি একধাপ অগ্রসর হয়ে বলেই ফেলেছেন, তিনি ইরাকি তেলক্ষেত্রসমূহের উন্নয়নে মার্কিন নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম গঠনে আগ্রহী। চালাবির মতে, ইরাকি তেলের বড় অংশীদার হবে মার্কিন কোম্পানিগুলো।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং তার ডেপুটি ডিক চেনি দু'জনেই তেল ব্যবসায় জড়িত ছিলেন এবং আছেন। '৭৫ সালে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে স্নাতক করে বুশ টেক্সাসে তেলের ব্যবসায় নিজের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেন। ডিক চেনি ছিলেন তেল কোম্পানি হেলিবার্টনের প্রধান। বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী ডোনাল্ড ইভান্সও টেক্সাসের তেল ব্যবসায়ী। সব মিলিয়ে পুরো বুশ প্রশাসন তেলের কারবারি। ইরাকে যুদ্ধ তাদের জন্য বয়ে আনবে অপার আর্থিক সম্ভাবনা। তাই মুখে সাদ্দামের গণবিধ্বংসী অস্ত্রের যত কথাই বুশ প্রশাসন বলুক, তাদের আসল টার্গেট যে ইরাকের তেল এ কথা বুঝতে কারোরই কষ্ট হবার কথা নয়।

বিশ্বের শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী দেশ

(হিসাব বিলিয়ন ব্যারেলে)

দেশ	মজুদ	দৈনিক উৎপাদন
সৌদি	২৬১.৮	৮.৮
ইরাক	১১২.৫	২.৪
আরব আমিরাত	৯৭.৮	২.৪
কুয়েত	৯৬.৫	২.১
ইরান	৮৯.৭	৩.৭
ভেনিজুয়েলা	৭৭.৭	৩.৪
রাশিয়া	৪৮.৬	৭.১
আমেরিকা	৩০.৪	৭.৭
লিবিয়া	২৯.৫	১.৪
মেক্সিকো	২৬.৯	৩.৬

(গত বছর ইরাকে খাদ্যের বিনিময়ে তেল রপ্তানি ছিলো দৈনিক ১.৭ বিলিয়ন ব্যারেল। এ বছরের প্রথমে ১.২। গত সপ্তাহে ৩,৭০,০০০ ব্যারেল)

'বুশ প্রশাসনের নিজের স্বার্থে এই যুদ্ধ'

স্কট রিটার, জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলের সাবেক প্রধান

মিশরীয় 'আল-আহরাম' সাময়িকীকে দেয়া স্কট রিটারের সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ

প্র : ১৯৯৯ সালে আপনার ইরাক বিষয়ক বই 'এন্ডগেম : সলভিং দি ইরাক প্রবলেম ওয়ানস এন্ড ফর এভার' প্রকাশিত হয়। এই খেলার (game) বর্তমান অবস্থা কি? এটি কি শেষ হয়েছে?

স্কট রিটার : ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো খেলা খেলিনি। সংশ্লিষ্ট কুশীলবদের কোনো পরিস্থিতি তিক্ত সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া বোঝাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 'এন্ডগেম' (endgame: খেলখেতম) টার্মটি ব্যবহার করেন। আমার বইয়ের শিরোনামে শব্দটি ব্যবহারের কারণ আমি ইরাকে মার্কিন ও জাতিসংঘের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে অবগত। আমি দেখাতে চেয়েছি কিভাবে এই দুই ক্রীড়নক উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে নিজেদের গা বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। খেলখতমের ব্যাপারটি মার্কিন সরকারের বিশেষ পছন্দনীয়। যারা ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত। আমার দৃষ্টিতে যা অগ্রহণযোগ্য- কেননা এই পছন্দের কোনো আন্তর্জাতিক আইনি ভিত্তি নেই। উপরন্তু, ইরাকে পরিচালিত ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণ কার্যক্রমের পর এই নীতি মানা যায় না। খেলখতম স্ট্র্যাটেজির ব্যাপারে কথা বলার মানে এই নয় যে, আমি এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছি। আসলে আমি এখানে কোনো ভূমিকা পালন করছি না।

প্র: এর আগে ইরাকিরা আনস্কম (UNSCOM)-এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে। যা ছিল জাতি-সংঘের ছত্রছায়ায় মার্কিন চালবাজি। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে?

রিটার : বিনাশর্তে পরিদর্শকদের ইরাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। এভাবে ইরাক ইস্যুর একটা সমাধান আসতে পারে। অর্থনৈতিক অবরোধের অবসান ঘটতে পারে। এরফলে বিশ্বের সঙ্গে ইরাক স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরে পাবে এবং উন্নততর অর্থনীতি উপভোগ করবে।

প্র : কিন্তু ইরাক কিভাবে নিশ্চিত হবে যে নতুন পরিদর্শকরা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করছে না?

রিটার : এর নিশ্চয়তা দেয়ার উপায় নেই। বিভিন্ন দেশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর আমি সর্বোত্তম যে পন্থা দেখেছি তাহলো, জাতিসংঘ পরিদর্শকদের সৎ প্রতিনিধি হতে হবে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদারকির জন্য তাদের ম্যান্ডেট দেয়া হয়। পর্যবেক্ষকদের কেউ গুপ্তচর নয়- এটি নিশ্চিত করা অসম্ভব। কিন্তু তারা নিরাপত্তা পরিষদের অর্পিত ম্যান্ডেটের বাইরে যাচ্ছে না, তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

প্র : আপনি কি বিস্তারিত বলতে পারবেন অতীতে অনস্কম কিভাবে বেঁধে দেয়া সীমা অতিক্রম করেছে?

রিটার : আনস্কমকে ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র; বিশেষত আনস্কমের দ্বিতীয় নির্বাহী পরিচালক রিচার্ড বাটলারের নেতৃত্বে। ১৯৯৭-৯৮ সময়কালে বাটলার জাতিসংঘ প্রদত্ত নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের বদলে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত আনস্কমের প্রধান হয়ে আমেরিকা ও ব্রিটেনের মর্জিমাফিক চলা শুরু করে। এ ধরনের দোস্তিতে যা হয় তা হলো দোস্ত সেই সম্পর্ককে অসৎ ও অপব্যবহারের সবুজ সংকেত লাভ করে।

প্র : বাটলারের মতো পরিদর্শকদের কিভাবে এড়ানো যায়?

রিটার : প্রথমে মূল বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। ইরাক শর্তহীনভাবে পরিদর্শকদের ফেরার অনুমতি না দিলে যুদ্ধ হবে এবং ইরাক ধ্বংস হয়ে যাবে। তার মানে পরিদর্শকদের ফেরাতে হবে অন্যথায় যুদ্ধ। এখন কোনো কোনো দেশের সরকার বলছে, ইরাক পরিদর্শকদের ফেরার অনুমতি দিলে পরিদর্শকদের ম্যান্ডেট মেনে চলার ব্যাপারটি তারা দেখবে। এটাই একমাত্র উপায়। কেউ কি সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে? না।

প্র : কিন্তু রামসফেল্ড বলছেন, পরিদর্শকদের প্রত্যাবর্তন এখন আর ইস্যু নয়...

রিটার : ডোনাল্ড রামস্‌ফেল্ড কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ বা সমগ্র বুশ প্রশাসনের পক্ষে কথা বলছেন না। তিনি বলছেন ডোনাল্ড রামস্‌ফেল্ডের পক্ষে। তার বক্তব্য ইরাকের ব্যাপারে বুশ প্রশাসনের দ্বিমতকে উন্মোচন করেছে। বুশ-প্রশাসন একদিকে বলছে, ইরাকে হামলা জরুরি। কারণ গণবিধ্বংসী অস্ত্র। একইসঙ্গে তারা বলছে, অস্ত্র পরিদর্শকদের ইস্যুটি এখন গুরুত্বহীন। তার মানে গণবিধ্বংসী অস্ত্র মূল ইস্যু নয়। তাহলে ইস্যু কোনটি? তারা কেন যুদ্ধের পক্ষে ওকালতি করছেন? তারা মার্কিন জনগণকে বোঝাচ্ছেন গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকায় ইরাক যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বিধায় যুদ্ধ অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একমাত্র উপায়, অস্ত্র পরিদর্শকদের ফিরিয়ে আনা, যেন তারা বিশ্বকে জানাতে পারে ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র নেই। তারা একথা বললে মার্কিন জনগণ বুঝতে পারবে যে মার্কিন স্বার্থের প্রতি হুমকি ইরাকে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ নয়। বরং বুশ প্রশাসনের নিজস্ব স্বার্থেই এই যুদ্ধ।